শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প

রফিকুর রশীদ

তাম্রলিপি

শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প
রফিকুর রশীদ

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪

তাম্রলিপি : ৭৯২

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
মা প্রিন্টিং প্রেস
১৮/২৩ গোপাল শাহ লেন, ঢাকা

মূল্য : ৩২০.০০

Srestho Kishoregolpo
By : Rafiqur Rashid
First Published : February 2024 by A K M Tariqul Islam Roni
Tamralipi, 38/4 Banglabazar, Dhaka–1100

Price : 320.00 $11

ISBN : 978-984-98741-2-6

উৎসর্গ

কবি শ্যামলকান্তি দাশ
সুহৃদবরেষু

ভূমিকা

কিশোর-পাঠক তথা ছোটোদের কথা ভেবেই লেখা হয় কিশোরগল্প।

বিচিত্র বর্ণে বর্ণিল কিশোর ভুবন। কত না উৎসাহ উদ্দীপনা আর কৌতূহলে ভরা দুরন্ত কিশোরবেলা! কত না অনুভূতিপ্রবণ সংবেদনশীলতা! কৈশোরের বেশিরভাগ সময় কাটে ইশকুলে। বন্ধুদের সঙ্গে হই চই, খেলাধুলা, লেখাপড়া, ইশকুলের টিচার এমন কি দপ্তরিটি পর্যন্ত কিশোরগল্পের চরিত্র বা বিষয়বস্তু হয়ে আসে। ইশকুলের বাইরে থাকে পারিবারিক পরিমণ্ডল। সেখানে নিতান্ত আপনজনদের সঙ্গে অভিমান, দুষ্টুমি, খুনসুটি মিলিয়ে রচিত হয় মধুর স্মৃতি। সেই স্মৃতি উঠে আসে কিশোরগল্পে। আমাদের জাতীয় দিবসসমূহ, মহান নেতৃবৃন্দ এবং কবি সাহিত্যিকের ছেলেবেলার ঘটনা নিয়েও মজার মজার গল্প লেখা হয়েছে ছোটোদের জন্যে।

১৯৭৬ সালে 'দুঃস্বপ্ন' নামে একটি কিশোরগল্প রচনার মধ্য দিয়েই শুরু হয় আমার কিশোরসাহিত্যের আলোকিত জগতে যাত্রা। তারপর চার দশকেরও অধিক সময় ধরে গল্পই লিখে চলেছি। বড়োদের গল্প শুধু নয়, আছি ছোটোদের গল্পের সঙ্গেও। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি থেকে প্রকাশিত আমার প্রথম কিশোরগল্পের বই 'প্রভাতফেরি' ২০০৩ সালে এম নুরুল কাদের শিশুসাহিত্য পুরস্কার এনে দেয়; তারপর থেকে স্বীকৃতি ও সম্মাননার বেশিরভাগই এসেছে শিশুকিশোর সাহিত্যচর্চার সুবাদে। এ নাগাদ আমার কিশোরগল্পের বই বেরিয়েছে দুই ডজনের কাছাকাছি।

সেই সব গল্পের রাজ্য থেকে আমি নিজেই এই গ্রন্থের জন্যে বাছাই করে দিয়েছি বেশ কিছু কিশোরগল্প। তাই নিয়েই সাজানো হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কিশোরগল্প'। আমাদের কিশোরসাহিত্যের বিশাল জায়গা জুড়ে আছে ভাষা-আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব। কিশোরগল্পের ক্ষেত্রেও সেই ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়। সঙ্গত কারণেই ভাষাশহিদ রফিক যেমন গল্পের চরিত্র হয়ে এসেছে, আবার মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শিশু-কিশোরবেলার ঘটনা নিয়েও লেখা হয়েছে নানা বর্ণে বর্ণিল কিশোরগল্প। আর

সেই সাথে আছে মুক্তিযুদ্ধের কিশোরগল্প। এই সব মিলিয়ে দিনে দিনে বিস্তৃত হয়েছে আমার কিশোরগল্পের বহু বিচিত্র দিগন্ত। আমি পরম আনন্দে সেই দিগন্ত স্পর্শ করতে চেয়েছি কিশোরগল্পের ভুবনে ডুব দিয়ে। সত্যি এ এক অনন্য আনন্দ-ভুবন।

কিশোরগল্পের পাঠক হতে মানা নেই কারো। যেকোনো বয়সের পাঠকই পারেন কিশোরগল্পের আনন্দময় জগতে প্রবেশ করতে এবং হারিয়ে যাওয়া নিজের কিশোরবেলার সঙ্গে এই সব উদ্দীপনাময় গল্পগাথা মিলিয়ে নিতে। অসম্ভবকে সম্ভব করার দুঃসাহসিক স্বপ্ন দেখে কিশোরেরা। স্বপ্নভঙ্গের বেদনার অভিঘাত যেমন কিশোরমানসে ঢেউ তোলে, আবার ঘুরে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞাও তেমনি অঙ্কুরিত হয় কিশোর মনোভূমিতেই। এই সব মিলিয়ে আমার লেখা বিচিত্র কিশোরগল্পের ভুবন থেকে নির্বাচিত গল্প নিয়ে রচিত এই বইটি পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আশা করা যায়।

সূচিপত্র

উঠল জেগে রবি	১১
ওরা তিনজন	১৫
ঠাকুরবাড়ির ঈশ্বর	১৯
শিমুলের ছোপ	২৪
দুখুর ভাঙা স্বপ্ন	৩০
যেদিন খোকার জন্মদিন	৩৪
বহমান	৩৭
রূপার শোকদিবস	৪৪
শুভ জন্মদিন	৪৮
শেখ রাসেলের সবুজ খাতা	৫৪
প্রভাতফেরি	৬০
ফুলের ভাষা	৬৫
পিকলুর মুক্তিযুদ্ধ	৬৯
ইচ্ছেপুতুল	৭৬
ভূত এবং ভূমিকম্প	৮৪
ভূতের মেয়ের জন্মদিন	৮৭
স্বপ্নের স্কুল	৯৩
লাস্টবেঞ্চের ছেলেটি	৯৮
সেদিন রেসকোর্স এবং...	১০৫
মেজমামার বাড়ানো হাত	১১৩
ঈদের চাঁদ	১১৮
ঈদ-আনন্দ	১২৩
আকাশ আবার ফার্স্ট হবে	১২৮
একটি কলম কাহিনি	১৩৪
রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে একদিন	১৪১

উঠল জেগে রবি

সকাল তখনও হয়নি।

হালকা কুয়াশার চাদরে ঢাকা কলকাতা শহর বেশ আছে ঘুমের ঘোরে। পুবের আকাশে অন্ধকারের ঘোমটা সরানোর আয়োজন শুরু হয়েছে। ভোরের আলো সবে ফুটতে চাইছে একটু একটু করে। গাছপালা বাড়িঘর ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

শহরের উত্তর দিকে জোড়াসাঁকো। খুব অভিজাত এলাকা। এই জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ছয় নম্বরে গিয়ে বিরাট এক প্রাসাদ। হ্যাঁ, বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভালো। এই প্রাসাদের নিচতলা উপরতলা জুড়ে কত যে ঘরদোর! কোন তলার কোন মহলার ঘরদোর কার জন্য বরাদ্দ, সে সব ঠিকঠাক বন্দোবস্ত করা আছে। তিনতলার লম্বা এক ঘরের মাঝখানে নকশাকাটা দামি পালঙ্কে পাতলা মশারির তলে ঘুমিয়ে আছেন সারদা সুন্দরী। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। তার ঘরের পাশের লম্বা ঘরটিতে শুয়ে আছে ফুটফুটে সুন্দর তিনটি ছেলে। লেপ মুড়ি দিয়ে মশারির তলে ঘুমোচ্ছে তারা। পাশাপাশি শুয়ে আছে অবোধ শান্ত হয়ে। জেগে থাকলে তারা কেউ এমন শান্ত থাকে না। সারদা সুন্দরী পাশের ঘর থেকে ঠিকই নজর রাখেন প্রায় সমবয়সী তিনটি বালকের প্রতি। নজরদারি করার জন্য আরো এক বৃদ্ধা দাসী আছে। সে থাকে দুই ঘরের সামনেকার টানা বারান্দায়। দরজা দিয়ে বেরুনোর মুখে তোশক-মাদুর বিছিয়ে তার পাশে শয্যা পাতে। কীসের নজরদারি! দু'চার মিনিট না পেরোতেই সে ঘুমিয়ে কাদা। তখন তার নাক মুখের ফাঁকফোকর দিয়ে বেরুনো বিচিত্র ধ্বনি ছেলেদের ঘরের ভেতরে দেওয়ালে দেওয়ালে আছড়ে পড়ে।

ধ্বনিময় সেই আবহের মধ্যেই ছেলেরা প্রতিদিন ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগেও ওঠে। প্রাত্যহিক সেই ধ্বনিতরঙ্গের সঙ্গে তারা এতটাই পরিচিত এবং এমনই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে এ ঘটনা তাদের মনে নতুন কোনো প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে না। তারা দিব্যি আছে এই নাক-ডাকা শব্দের মধ্যে।

ছেলেদের বিছানায় হঠাৎ লেপের এক প্রান্ত নড়েচড়ে ওঠে। শুধু নড়ে ওঠা নয়, খুব আস্তে আস্তে গায়ের উপর থেকে লেপ সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে ফুটফুটে সুন্দর একটি মুখ। ঘুমের জড়তা তার চোখমুখ থেকে একেবারে মুছে যায়নি। ছেলেটি হাতের তেলোয় চোখ রগড়ে পিটপিট করে তাকায়। বড় একটা হাই তোলে। আড়মোড়া ভাঙে। তারপর এক নিমেষে লেপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বাইরে। উঠে দাঁড়ায় সটান। গায়ে তার খুব সাধারণ একটা জামা। পাতলা ফিনফিনে কাপড়। লেপের বাইরে তখনও কনকনে ঠান্ডা। শীতের হাওয়া এসে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দেয় শরীর। কিন্তু তাতে কী! ছেলেটির যেন পরোয়া নেই কিছুতেই। মাথার কাছে বালিশের পাশে ভাঁজ করে রাখা অন্য একটি সাদা জামার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। একটানে সেই জামাটা তুলে নিয়ে গায়ে পরতে চেষ্টা করে। জামার ফোকরে মাথা গলিয়ে দিতেই কানে আসে প্রভাতপাখির কলকাকলি। পাখির কণ্ঠ তাকে অস্থির করে তোলে। হাতের জামা টেনেটুনে গায়ে পরার বদলে সে দ্রুত হাতে খুলে বিছানার উপরে ফেলে দেয়। তারপর মশারি তুলে এক লাফে বেরিয়ে আসে বিছানা থেকে।

মশারির বাইরে আসা মানেই কি মুক্তির আনন্দ পাওয়া! ভালো লাগে না, তবু প্রতিদিনই ঢুকতে হয় মশারির ভেতরে। সকাল হলে বাইরে এসে তবেই স্বস্তি। আনন্দ। এদিকে শীতের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে বুকের সামনে দু'হাত জড়ো করতেই হয়। যেনবা দু'হাত জড়ো করেই শীতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায়। অথবা হয়তো সে পাত্তাই দিতে চায় না শীতের বাহাদুরিকে। তাই সে বুকের সঙ্গে দু'হাত ঝুলিয়ে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। ঘরের দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসে বারান্দায়। যেদিক থেকে পাখির কাকলি ভেসে আসে, সেই দিকে সে ছুটে আসে। শীতের হাওয়া এসে জাপটে ধরে, প্রবল ঝাঁকুনি দেয় শরীরে ; তবু তার কিছু যায় আসে না। তার মনোযোগ হয়তো বা অন্য কোথাও। সেই জন্যে খুব তাড়া।

দরজা পেরিয়ে সে বেরিয়ে আসে, তবু কারো ঘুম ভাঙে না। বৃদ্ধা দাসী তেমনই শুয়ে আছে দরজার পাশে। মশারির তলে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে তার সঙ্গী-সাথিরা। শীতের ভোরে লেপের ওম ছেড়ে কে চায় বাইরে বেরোতে! ভেতরের ঘরে নির্বিকার ঘুমিয়ে আছেন সারদা সুন্দরী। তারও ঘুম ভাঙে না এতটা ভোরে।

ছেলেটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে টানা বারান্দায় একটুখানি থমকে দাঁড়ায়। সে এক মুহূর্ত মাত্র। চোখ মেলে দ্যাখে চারপাশে। দেখতে পায় অস্বচ্ছ আকাশ। কী যে ভাবনা হয় তার, ছুটে চড়ে যায় সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় চারতলায়। বন্ধ দরজা থেকে ভেসে আসে পাখির কাকলি। ছেলেটি কান খাড়া করে। মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। খালি পায়ে সে এগিয়ে যায় পুবদিকের রেলিঙের কাছে। হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরে রেলিং। কিন্তু সে রেলিং তার মাথার চেয়ে উঁচু। গোড়ালি উঁচু করে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে মাথা তুলে তাকায়। নাহ্, চোখের সামনে থেকে রেলিঙের আড়াল কিছুতেই সরে না।

এ সময়ে তার মন খারাপ করে। হিসাব মেলায় মনে মনে... এখনো সে কত ছোটো! তার ভাই সোমেন্দ্র মানে সোম তার চেয়ে দু'বছরের বড়ো, বড়দির ছেলে সত্য, সম্পর্কে ভাগ্নে, সেও চার বছরের বড়ো। ওরা এলে হয়তো এই টানা টানা রেলিঙের নাগাল পেত এবং মুখ বাড়িয়ে ঠিকই দেখতে পেত...কেমন করে নতুন একটি দিনের সূচনা হয়, অন্ধকারের ওড়না সরিয়ে কেমন করে সূর্য হাসে। আহা, ওরা এ সব দেখবে কী করে! ওরা আছে লেপের মধ্যে গভীর ঘুমে। প্রশ্ন জাগে, ভোরবেলার এত সব আয়োজন ওদের কি মোটেই টানে না! এই যে পাখির কাকলি, ভোরের সূর্যোদয়...কিছুই কি দেখবে না ওরা!

বাতাসের মৃদু শিহরণ গায়ে কাঁটা দেয় ছেলেটির। কেঁপে ওঠে সে। দুই বগলের তলে দুই হাত চালিয়ে দিয়ে সে আকাশের দিকে হাঁ করে তাকায়। আকাশে তখন চলছে রং বদলের খেলা। তারা ঝলমলে রাতের আকাশ নিজের আঁচল গুটিয়ে নিতে ব্যস্ত। রঙে রেখায় কোনো চিহ্নের অবশেষ মাত্রও বুঝি সে রাখতে চায় না ; দিন এসে বুঝে নিতে চায় আকাশের রংবদলের কারুকাজ।

ছেলেটি আর দাঁড়ায় না ছাদে। পাখিদের ডাকাডাকি তাকে আকুল করে তোলে। আকাশের গায়ে রঙের আভা বদলের ইঙ্গিত তার কচি মনকে উতলা করে তোলে। তখন সে কী করে! দে ছুট সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তেতলা থেকে দোতলা। দোতলা থেকে একতলা। উঠোন পেরিয়ে খোলা বাগান। সেইখানে দাঁড়িয়ে দু'চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে সে তাকিয়ে থাকে পূর্বদিগন্তে, সারি সারি নারকেল গাছের মাথা ছাড়িয়ে বহুদূরে। দিনের প্রথম সূর্য ছড়িয়ে দেবে কিরণরাশি। নারকেল পাতার

ঝালরে ঢেউ খেলে যাবে রোদের রেণু। নরম রোদে গা ভিজিয়ে ভোরের আকাশ দেখতে খুব ভালো লাগে রবির।

রবি মানে রবীন্দ্রনাথ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাপ-দাদার জমিদারি সূত্রে রবীন্দ্রনাথও জমিদার হয়েছেন। কিন্তু মানুষের আনন্দ-বেদনা হৃদয়ের গভীরে অনুভবের পর কবিতায় প্রকাশ ঘটিয়ে তিনি হয়েছেন কবি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওরা তিনজন

ওরা তিনজন।

সত্য, সোম আর রবি।

একই বাড়িতে একই ছাদের তলে ওদের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। একই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ইশকুলে যাওয়া, এমন কি একই মশারির তলে ঘুমানো পর্যন্ত। সবই চলে এক সঙ্গে। বয়স ওদের খেতে কাছাকাছি। গলায় গলায় ভাব। আবার দুষ্টুমি-খুনসুটিতেও কম যায় না মোটেই। দিনরাতের তিনসঙ্গী।

ভালো করে সকালের আলো ফুটতে না ফুটতেই তিন বালক জেগে ওঠে ঘুম থেকে। বিছানা ত্যাগ করে। দিনের সূচনা হয় কানা পালোয়ান হীরা সিং-এর তত্ত্বাবধানে কুস্তি লড়াইয়ের প্র্যাকটিসের মধ্য দিয়ে। কঠোর পরিশ্রম। কঠিন অনুশীলন। হীরা সিং-এর কাছে কারো মাফ নেই। তার যে দশাসই চেহারা, সামনে দাঁড়িয়ে তার কথার প্রতিবাদ করবে কে! কাজেই বুক-ডন, হাফ-ডন, কুস্তি... সে যখন যেটা বলবে তা-ই করতে হবে। বাড়িসংলগ্ন বাগানের এক প্রান্তে সে মেটে কুস্তির আখড়া খুলেছে। সারা গায়ে সেই আখড়ার মাটি মেখে ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের নানান রকম শারীরিক কসরত এবং কুস্তি শিখতে হয়। সব শেষে যে গায়ের ধুলোমাটি ঝেড়ে ছাফছুতরো হবে তারও উপায় নেই। ছুটে যাবে হীরা সিং। আখড়ার মাটি বিশেষ রকমের পবিত্র, সেই মাটিকে অবজ্ঞা করলে চলে! হীরা সিং-এর মন রাখতে এ বাড়ির বড়োরা পর্যন্ত আখড়ার মাটির গুণাগুণের পক্ষে সাফাই গায়।

সেদিন সকালবেলা কুস্তির আখড়ায় এসে হাজির হেমেন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের সেজো দাদা। সবল স্বাস্থ্যবান যুবক। তিন বালকের মাটিমাখা শরীর দেখে তার দয়া টয়া হবে হয়তো। সে একবার ঘাড় তুলে আকাশের দিকে তাকায়, সূর্যের অবস্থান নির্ণয় করে, তারপর কানা পালোয়ানের কাছে এগিয়ে এসে বলে,

আজ এই পর্যন্তই থাক সিংজি।

হীরা সিং তো অবাক। হেমেন্দ্রের মতো করে সেও একবার আকাশ দেখে। কী বোঝে সেই জানে, খুব মন খারাপ করে সে জানতে চায়,

কিনো হেমেন্দ্রবাবু, এখনো তো সুরুজ দেওতা ভালো করে উগেননি!

হীরা সিংকে কিছু বলার আগে তিন বালকের দিকে তাকিয়ে হেমেন্দ্র নির্দেশ দেয়,

সত্য, সোম, রবি...চলো তোমরা, চলো...

ব্যাকুল হয়ে ওঠে হীরা সিং,

কই, সুরুজ দেওতা...

হেমেন্দ্রনাথ এতক্ষণে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়,

ওরা পড়তে বসবে। তারপর সাতটায় উপাসনা। আমাদের দেরি হয়ে যাবে।

হেমেন্দ্রের এ ঘোষণায় হীরা সিং যে মোটেই খুশি হতে পারে না, সেটা তার চেহারায় বেশ ফুটে ওঠে। তাই সে মনে মনে গজর গজর করতেই থাকে। এ দিকে তিন বালকই ধীরে ধীরে কুস্তির আখড়া পরিত্যাগের প্রস্তুতি নেয়। রবীন্দ্রনাথ এক ধাপ এগিয়ে। সারা শরীর থেকে আখড়ার মাটি মুছে ফেলার কাজে সে ব্যস্ত। তাই দেখে রে রে করে তেড়ে ওঠে সিংজি,

আরে আরে রবিবাবু!

হেমেন্দ্র বুঝতে পারে, রবির এ কাজ মোটেই পছন্দ করতে পারছে না হীরা সিং। একই প্রশ্ন সে ঘুরিয়ে করে... কী করছিস রবি?

রবীন্দ্রনাথের সহজ উত্তর,

গা-হাত-পার মাটি ছাফ করছি।

হেমেন্দ্র ছোটোভাইটির কাঁধে হাত রেখে পরামর্শ দেয়,

গায়ের মাটি ঝাড়িসনে রবি। স্নান করার সময় ধুয়ে ফেলিস।

জামা পরব যে! শীত লাগছে!,

আহা, জামা পরে নে। শীতে মরবি নাকি!

এই ধুলোমাটি গায়ে নোংরা লাগছে যে সেজদা!

রবীন্দ্রনাথের সেজোদাদা হেমেন্দ্রনাথ এক গাল হাসি ছড়িয়ে ছোটো ভাইটিকে বলে, নোংরা কীসের, এ্যাঁ! এ মাটির কত গুণ তা জানিস?

রবি তাকিয়ে থাকে সেজদার মুখের দিকে। সেজদা বুঝিয়ে বলে,

এ হচ্ছে আখড়ার মাটি। তেল, খোল, কত রকম শেকড়বাকড়, জড়িবুটি এই মাটির সঙ্গে মেশানো আছে, তাই না সিংজি?